ইমামতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

এইচ এইচ এস আসিফ আলী ইমামি

ইমামতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

লেখকঃ এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ মাক্তাবে সাকাইল

www.maqtabethaqalayn.com

Maqtab e Taqalayn

maqtabthaqlayn@gmail.com

01924892101

47/1, Projapara, Pirganj, Rangpur.

Amin e Maqtab e Thaqalayn
HHS Asif Ali Imamy

maqtabethaqalayn.com

ইসলামে ইমামত হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি অবস্থান। কারণ এটি উম্মাহকে রক্ষা করে, শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাযত করে, তাদের জন্য মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং উম্মাহ যা কিছু প্রত্যাশা করে তার সবকিছুই বাস্তবায়ন করে।
ইমাম রেজা (আ.) আবদুল আজিজ ইবনে মুসলিমের কাছে একটি বিস্তৃত হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে ইমামতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইমামত ইসলামের গৃহীত লক্ষ্য ও আদর্শগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ভিত্তি।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বেই উম্মাহর জন্য নেতা ও পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করে গেছেন। আর তিনি হলেন ইসলামের প্রজ্ঞার অগ্রদূত ইমাম আমিরুল মুমিনীন (আ.)। ইমামত সম্পর্কে ইমাম রেজা (আ.)-এর সেই মূল্যবান হাদীসটি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

ইমামত সম্পর্কে ইমাম রেজা (আ.)-এর বাণী

ইমাম রেজা (আ.) বলেছেন:
«হে আবদুল আজিজ! জাতি অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়েছে এবং তারা তাদের দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে প্রতারিত হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর নবী (সা.)-এর ওফাত দেননি যতক্ষণ না তাঁর জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা। তিনি এতে হালাল-হারাম, দণ্ডবিধি (হুদুদ), বিধানসমূহ এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন: (আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিইনি...)[১]। তিনি বিদায় হজের সময়—যা ছিল নবী (সা.)-এর জীবনের শেষ পর্যায়—এই আয়াত নাজিল করেন: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম)[২]।

ইমামতের বিষয়টি দ্বীনের পূর্ণতারই অংশ। নবী (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নেননি যতক্ষণ না তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দ্বীনের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন, তাদের পথ স্পষ্ট করেছেন এবং তাদের সত্যের পথে রেখে গেছেন। তিনি তাদের জন্য আলী (আ.)-কে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। উম্মতের প্রয়োজন হতে পারে এমন কোনো কিছুই তিনি বর্ণনা না করে রেখে যাননি। সুতরাং, যে ব্যক্তি দাবি করে যে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর দ্বীন পূর্ণ করেননি, সে মূলত আল্লাহর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করল। আর যে আল্লাহর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের।'

এই অংশটি নবী (সা.)-এর কাছে ইমামতের চরম গুরুত্বের কথা তুলে ধরে। ইমামত হলো তাঁর শাশ্বত রিসালাতের অন্যতম প্রধান উপাদান; কারণ এরই মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা এবং নেয়ামত সম্পূর্ণ হয়েছে। নবী (সা.) এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তাঁর ভাই এবং তাঁর ইলমের শহরের দরজা ইমাম আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে মনোনীত করেছিলেন।

তিনি তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং গাদিরে খুমে মুসলমানদের নির্দেশ দেন তাঁর আনুগত্যের বয়াত গ্রহণ করতে। এর মাধ্যমে নবী (সা.) তাঁর উম্মতের পথ সুস্পষ্ট করে গেছেন এবং তাঁর পরবর্তী বিষয়টিকে বিশৃঙ্খলার ওপর ছেড়ে দেননি।

ইমামতের মাহাত্ম্য ও ঐশী নির্বাচন

এখন আমি ইমাম (আ.)-এর বক্তব্যের আরেকটি অংশ উল্লেখ্য করবো যেখানে তিনি বলেন:

«তারা কি ইমামতের মর্যাদা এবং উম্মতের মাঝে এর অবস্থান সম্পর্কে জানে যে, এ ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচন (পছন্দ-অপছন্দ) চলবে? নিশ্চয়ই ইমামত হলো অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ, সুমহান শান-মান সম্পন্ন, সর্বোচ্চ উচ্চাসীন, এক দুর্ভেদ্য দিক এবং এত গভীরতর বিষয় যে মানুষ তাদের বুদ্ধি দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে পারবে না বা তাদের নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে তা লাভ করতে পারবে না, অথবা নিজেদের পছন্দে কোনো ইমাম নিযুক্ত করতে পারবে না।

নিশ্চয়ই ইমামত এমন এক বিষয় যা আল্লাহ বিশেষভাবে ইব্রাহিম খলিল (আ.)-কে দান করেছিলেন—নবুয়ত ও বন্ধুত্বের (খুল্লাত) পর্যায়ের পর তৃতীয় একটি মর্যাদা হিসেবে। এটি এমন এক শ্রেষ্ঠত্ব যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: (আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম নিযুক্ত করছি)[৩]।
তখন ইব্রাহিম খলিল (আ.) এতে আনন্দিত হয়ে বললেন: (এবং আমার বংশধরদের থেকেও কি?)। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বললেন: (আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের কাছে পৌঁছাবে না)। ফলে এই আয়াতটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল জালেমের ইমামতকে বাতিল করে দিয়েছে এবং এটি কেবল মনোনীত ব্যক্তিদের (সাফওয়াহ) জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁকে সম্মানিত করেছেন এই ইমামতকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা মনোনীত ও পবিত্র তাদের জন্য নির্ধারিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

(এবং আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকুব; এবং প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মপরায়ণ করলাম। আর আমি তাদের ইমাম নিযুক্ত করলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শন করত; আমি তাদের প্রতি ওহী পাঠাতাম সৎকাজ করার, নামাজ কায়েম করার এবং জাকাত প্রদান করার; আর তারা ছিল আমারই ইবাদতকারী)[৪]।

অতঃপর এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একের পর এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে উত্তরাধিকার সূত্রে চলতে থাকে, যতক্ষণ না নবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী হন। মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারাই যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক)[৫]।
সুতরাং ইমামত বিশেষভাবে তাঁর (নবীর) জন্য নির্ধারিত ছিল। অতঃপর নবী (সা.) আল্লাহর নির্দেশে এবং আল্লাহ যা ফরজ করেছিলেন সেই নিয়ম অনুযায়ী তা আলী (আ.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন।

ফলে এটি তাঁর সেই মনোনীত বংশধরদের মাঝে স্থিত হয়েছে যাদের আল্লাহ ইলম ও ঈমান দান করেছেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে: তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ...)[৬]। অতএব, ইমামত কিয়ামত পর্যন্ত বিশেষভাবে আলী (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যেই থাকবে; যেহেতু মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী নেই। তাহলে এই মূর্খরা কোথা থেকে (নিজেদের ইমাম) নির্বাচন করে?»

ইমাম রেজা (আ.) এই অনুচ্ছেদে ইমামত নির্বাচনের অসম্ভবতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইমামত জনসাধারণের ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়; কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে বিষয়ের গভীর বাস্তবতা ও নিগূঢ় সত্য জানা সম্ভব নয়। বরং ইমামতের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর হাতে। তিনি তাঁর বান্দাদের নেতৃত্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন,

যার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া, দ্বীনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং উম্মাহর যাবতীয় প্রয়োজনের জ্ঞান বিদ্যমান। যাতে তিনি মানুষের জন্য একটি মর্যাদাশীল জীবন নিশ্চিত করতে পারেন, যেখানে নিপীড়ন, জুলুম, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের কোনো স্থান থাকবে না।

ইমামত হলো নবুয়তের মতোই, যার চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তিনি তাঁর সর্বোত্তম বান্দা ইব্রাহিম খলিল (আ.)-কে এটি দান করেছিলেন। তাঁর পরে এটি তাঁর বংশধরদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন—ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর এটি আম্বিয়া-কুল শিরোমণি মহান রাসূল (সা.)-এর কাছে আসে। তিনি তাঁর পরে তাঁর ইলমের শহরের প্রবেশদ্বার এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে এই পদে অভিষিক্ত করেন। এরপর তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে পবিত্র ইমামগণের নিকট এটি পর্যায়ক্রমে আসে, যাঁরা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম মনোনীত ব্যক্তি।

তিনি আল্লাহর দণ্ডবিধি কায়েম করেন, আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করেন এবং প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ ও অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর রবের পথের দিকে আহ্বান জানান।

ইমাম হলেন পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ, প্রদীপ্ত চেরাগ, বিচ্ছুরিত আলো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার, মরুপ্রান্তর ও উত্তাল সমুদ্রের মাঝে পথপ্রদর্শক নক্ষত্র। ইমাম হলেন তৃষ্ণার্তদের জন্য সুপেয় পানির প্রস্রবণ [৭], বিপদসংকুলে সঠিক পথপ্রদর্শক; যে তাঁকে ত্যাগ করে সে ধ্বংস হয়।

ইমাম হলেন বারিবর্ষণকারী মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, প্রদীপ্ত সূর্য, বিস্তীর্ণ ভূমি, প্রবহমান ঝরনা, জলাধার ও কানন। ইমাম হলেন একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী, পরম দয়ালু পিতা, সহোদর ভাই এবং মহাবিপদে বান্দাদের আশ্রয়স্থল।”

ইমামতের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মানুষের সীমাবদ্ধতা

ইমাম রেজা (আ.) আরও বলেন:
“ইমাম হলেন তাঁর জমিনে আল্লাহর আমানতদার, তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর হুজ্জত (প্রমাণ) এবং তাঁর জনপদসমূহে তাঁর খলিফা। তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং আল্লাহর পবিত্র বিধান সমূহের রক্ষক।

ইমাম গুনাহ থেকে পবিত্র এবং সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে ভূষিত। তিনি দ্বীনের শৃঙ্খলা, মুসলমানদের সম্মান, মুনাফিকদের ক্রোধের কারণ এবং কাফেরদের ধ্বংসের উৎস।

ইমাম তাঁর যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব; কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না, কোনো আলেম তাঁর সমান হতে পারে না। তাঁর কোনো বিকল্প নেই, নেই কোনো সদৃশ বা নজির। তিনি সকল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী—?

যা তিনি নিজে চেয়ে বা অর্জন করে পাননি, বরং এটি পরম দাতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ দান। সুতরাং এমন কে আছে যে ইমামকে চেনার সামর্থ্য রাখে অথবা তাঁকে নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে

অসম্ভব, অনেক দূরে! বুদ্ধি এখানে পথ হারিয়েছে, প্রজ্ঞা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিবেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে, চক্ষু ক্লান্ত হয়েছে, মহৎ ব্যক্তিরা তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়েছে, জ্ঞানীরা দিশেহারা হয়েছে এবং ধৈর্যশীলরা হার মেনেছে। বাগ্মীরা নির্বাক হয়েছে, বুদ্ধিমানরা অজ্ঞ প্রতিপন্ন হয়েছে, কবিরা ক্লান্ত হয়েছে, সাহিত্যিকরা অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং অলঙ্কারবিদরা তাঁর মর্যাদার কোনো একটি দিক বা গুণের কোনো একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তারা সকলেই তাদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছে।

কীভাবেই বা তাঁর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, কিংবা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করা যায়, অথবা তাঁর কোনো বিষয় উপলব্ধি করা যায়? আর কোথায় এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তাঁর অভাব পূরণ করতে পারে? এটা কীভাবে সম্ভব যখন তাঁর অবস্থান নাগালের বাইরে থাকা নক্ষত্রের মতো—যেখানে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পৌঁছাতে পারে না? এমতাবস্থায় (জনসাধারণের মাধ্যমে) নির্বাচন করার সুযোগ কোথায়?

আর মানুষের বুদ্ধিই বা কোথায় (যা দিয়ে ইমামকে বিচার করবে)? কোথায় এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধান মিলবে? তারা কি ধারণা করে যে, রাসূল (সা.)-এর বংশধর (আলে মুহাম্মদ) ব্যতীত অন্য কোথাও এমনটি পাওয়া যাবে? আল্লাহর কসম! তাদের আত্মা তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে এবং বাতিল তাদের প্রলুব্ধ করেছে। তারা এক দুর্গম পাহাড়ে আরোহণ করতে চেয়েছিল, যা অত্যন্ত পিচ্ছিল; ফলে সেখান থেকে পাদদেশ অভিমুখে তাদের পা পিছলে পড়ে গেছে...”

ইমাম রেজা (আ.)-এর বক্তব্যের এই অংশটি ইমামের চরম গুরুত্ব বর্ণনা করে। তিনি তুলে ধরেছেন যে, ইমাম হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। উম্মতের সমস্ত কল্যাণ এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ ইমামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। একইভাবে দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করা, সীমান্ত রক্ষা করা, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম ঘোষণা করা এবং মুসলমানদের বাস্তব জীবনে মহান আল্লাহর বিধানসমূহ প্রয়োগ করা ইমামের সাথেই সম্পৃক্ত।

এটি নিশ্চিত যে, জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে ওই সকল সুমহান লক্ষ্য ও আদর্শ হেদায়েতের ইমামগণ (আ.) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে বাস্তবায়ন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অথচ জালেম ও অত্যাচারী শাসকরা তাঁদেরকে সেই অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল যা আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন। ফলে উম্মাহকে এর বিনিময়ে সব ধরণের জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.)-এর ইমামগণের প্রতি জালেম শাসকদের অবস্থান

ইমাম রেজা (আ.) আহলে বাইত (আ.)-এর ইমামগণের প্রশংসা এবং জালেম শাসকদের বিরোধিতা অব্যাহত রেখে তাদের নিযুক্তকারীদের সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেন:
“তারা তাদের অন্যায্য, ধ্বংসশীল ও অপূর্ণ বুদ্ধি এবং বিভ্রান্তিকর মতামতের ভিত্তিতে ইমাম নিযুক্ত করতে চেয়েছিল; কিন্তু এতে তারা কেবল (সত্য থেকে) দূরেই সরে গেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? তারা এক কঠিন কাজের সংকল্প করেছিল, তারা মিথ্যা বলেছিল এবং চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল। তারা এক ঘোর সংশয়ে নিপতিত হয়েছে কারণ তারা জেনেবুঝে সত্যকে বর্জন করেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে শোভনীয় করে তুলেছিল, ফলে সে তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে যদিও তারা দেখার ও বোঝার ক্ষমতা রাখত।

তারা আল্লাহর পছন্দ এবং তাঁর রাসূলের পছন্দকে উপেক্ষা করে নিজেদের পছন্দের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অথচ কুরআন তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছে: (এবং তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন; তাদের কোনো অধিকার নেই নির্বাচনের। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে)[৮]।

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আরও বলেছেন: (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সেই বিষয়ে নিজেদের কোনো ইখতিয়ার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে না)[৯]।

তিনি আরও বলেছেন: (তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা দিচ্ছ? তোমাদের কি কোনো কিতাব আছে যাতে তোমরা এসব পড়ছ? যে, তোমাদের জন্য তাতে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ করো? না কি তোমাদের জন্য আমার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোনো অঙ্গীকার আছে যে, তোমরা যা ফয়সালা করবে তা-ই তোমাদের জন্য হবে?

তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে কে এই বিষয়ে জিম্মাদার? নাকি তাদের কোনো শরিক আছে? তাহলে তারা তাদের শরিকদের নিয়ে আসুক যদি তারা সত্যবাদী হয়)[১০]।”

ইমামতের ঐশ্বরিক মানদণ্ড ও যোগ্যতার বর্ণনা

ইমাম রেজা (আ.) পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য চালিয়ে যান:
«এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: (তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা লাগানো রয়েছে?)[১১]। নাকি আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন যার ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না? নাকি তারা সেই লোকদের মতো যারা (বলে: আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী হলো সেই বধির ও বোবারা যারা কিছুই বোঝে না।

যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ জানতেন, তবে অবশ্যই তাদের শোনার তৌফিক দিতেন; আর যদি তিনি তাদের শোনাতেনও, তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিত এবং বিমুখ হয়ে থাকত)[১২]। তারা সেই লোকদের মতো যারা (বলেছিল: আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম)[১৩]। বরং এটি (ইমামত) হলো (আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন; আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল) [১৪]।

সুতরাং তারা কীভাবে ইমাম নির্বাচন করবে?! অথচ ইমাম হলেন এমন এক আলেম (জ্ঞানী) যার কোনো অজ্ঞতা নেই; এমন এক রাখাল (অভিভাবক) যিনি দায়িত্ব পালনে পিছুপা হন না। তিনি পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, ইবাদত, জগতবিমুখতা (যুহদ), জ্ঞান ও বন্দেগির খনি। তিনি বিশেষভাবে রাসূল (সা.)-এর দোয়ার ফল এবং তিনি পবিত্রা বা তুল (ফাতিমা সা.-আ.)-এর বংশধর। তাঁর বংশমর্যাদায় কোনো খুঁত নেই এবং অন্য কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষ নয়।

তাঁর বংশ কুরাইশ থেকে, শ্রেষ্ঠত্ব হাশেম বংশ থেকে এবং তিনি রাসূল (সা.)-এর পবিত্র বংশধারার (ইতরাত) অন্তর্ভুক্ত। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির আধার, আশরাফদের (অভিজাতদের) জন্য সম্মানস্বরূপ এবং আবদে মানাফের বংশের এক সুউচ্চ শাখা। তাঁর জ্ঞান ক্রমবর্ধমান, তাঁর ধৈর্য বা সহনশীলতা নিখুঁত। তিনি ইমামতের গুরুভার বহনে সক্ষম, রাজনীতিতে পারদর্শী এবং তাঁর আনুগত্য করা (উম্মতের ওপর) ফরজ। তিনি আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার নির্দেশ পালনে সদাতৎপর, আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষক।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবী ও ইমামদের (তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) এমন তৌফিক দান করেন এবং তাঁর ইলম ও হেকমতের ভাণ্ডার থেকে তাঁদের এমন কিছু দান করেন যা অন্য কাউকে দেন না। ফলে তাঁদের জ্ঞান তাঁদের সমসাময়িক সকল মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে থাকে।

মহান আল্লাহর বাণী: (যে সত্যের দিকে পথ দেখায় সে কি অনুসরণের বেশি যোগ্য, নাকি সে—যে নিজে পথ পায় না যতক্ষণ না তাকে পথ দেখানো হয়? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা দিচ্ছ?)[১৫]।

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আরও বলেছেন: (যাকে হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে, তাকে প্রকৃতই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে)[১৬]। তালুত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দান করেছেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন; আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ)[১৭]। এবং তিনি তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি বলেছেন: (তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান)[১৮]।'

এই অনুবাদের মাধ্যমে ইমাম রেজা (আ.)-এর বক্তব্যের মূল নির্যাস ফুটে উঠেছে, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে ইমামত কেবল একটি রাজনৈতিক পদ নয়, বরং এটি একটি সুউচ্চ আধ্যাত্মিক ও ঐশী মর্যাদা।

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর আহলে বাইত, ইতরাত ও বংশধরদের মধ্য থেকে মনোনীত ইমামদের সম্পর্কে বলেছেন: (নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, সেজন্য তারা তাদের প্রতি ঈর্ষা করে? অবশ্যই আমি ইব্রাহিমের বংশধরদের কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছি এবং তাদের বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; আর (তাদের দহনের জন্য) জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনই যথেষ্ট)[১৯]।

নিশ্চয়ই কোনো বান্দাকে যখন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দাদের আদিষ্ট বিষয়াবলি পরিচালনার জন্যে মনোনীত করেন, তখন তিনি সেই কাজের জন্য তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন, তার অন্তরে প্রজ্ঞার ঝরনাধারা গচ্ছিত রাখেন এবং তাকে বিশেষভাবে ইলম (জ্ঞান) ইলহাম করেন। ফলে এরপর তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লান্ত হন না এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হন না।

maqtabethaqalayn.com

তিনি মাসুম (নিষ্পাপ), (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সমর্থিত ও সঠিক পথে পরিচালিত। তিনি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ। আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে এ মর্যাদা দান করেন যেন তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর হুজ্জত (প্রমাণ) এবং সৃষ্টির ওপর সাক্ষী হতে পারেন। (এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন; আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল)[২০]।

তারা কি এমনটি করার ক্ষমতা রাখে? তারা কি এমন কাউকে নির্বাচন করতে পারবে যার মধ্যে এই গুণাবলি বিদ্যমান? অতঃপর তারা তাকে সামনে এগিয়ে দেবে? আল্লাহর ঘরের কসম! তারা সত্যকে অতিক্রম করে গেছে এবং আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের পেছনে নিক্ষেপ করেছে যেন তারা কিছুই জানে না। অথচ আল্লাহর কিতাবেই রয়েছে হেদায়েত ও শেফা (আরোগ্য)। তারা তা বর্জন করেছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন, তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাদের দুর্ভাগা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

maqtabethaqalayn.com

(আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত ছাড়া যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না)[২১]। আল্লাহ আরও বলেছেন: (সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মসমূহকে বিভ্রান্ত বা নিষ্ফল করে দিয়েছেন)[২২]। তিনি আরও বলেছেন: (আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ; এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন)[২৩], [২৪]।

এখানেই এই শরিফ হাদীসটি সমাপ্ত হলো, যা ইমামতের আবশ্যকতা সম্পর্কে অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ দলিল। এটি প্রমাণ করে যে, ইমামত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি অবস্থান এবং এটি উম্মতের পছন্দ বা নির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এর বিষয়টি মহান স্রষ্টার হাতে; তিনিই এই মহান পদের জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তিকে মনোনীত ও নিযুক্ত

করেন, যেন তিনি মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ ন্যায়বিচার ও পরম সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং মহান রাসূল (সা.)-এর নীতি অনুযায়ী তাদের শাসন করতে পারেন।

ইমাম (আ.)-এর আলামত ও গুণাবলি

ইমাম আলী রেজা (আ.) ইমামের আলামত ও গুণাবলি সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে:

“ইমামের কিছু আলামত বা চিহ্ন রয়েছে: তিনি হবেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী), সবচেয়ে বড় হাকীম (প্রজ্ঞাবান), সবচেয়ে বড় মুত্তাকী (পরহেজগার), সবচেয়ে ধৈর্যশীল, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে দানশীল এবং সবচেয়ে বড় এবাদতকারী…” [২৫]।

উম্মতের নেতৃত্ব দান এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের যোগ্য হওয়ার জন্য ইমামের (আ.) মধ্যে এই গুণাবলি থাকা আবশ্যক।

ইমামগণ (আ.) আল্লাহর খলিফা

আবু মাসুদ আল-জাফরি বর্ণনা করেছেন: আমি ইমাম আবুল হাসান রেজা (আ.)-কে বলতে শুনেছি: "ইমামগণ হলেন জমিনের বুকে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার খলিফা [২৬]।" এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আহলে বাইতের ইমামগণ (আ.) হলেন পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি, তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর হুজ্জত (প্রমাণ) এবং তাঁর জনপদসমূহে তাঁর আমানতদার। তাঁরাই এই উম্মতের নেতা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের পথের দিশারি।

উলিল আমর (কর্তৃত্বশীল)-এর আনুগত্যের হিকমত

ইমাম আলী রেজা (আ.) বলেছেন: "যদি কেউ প্রশ্ন করে—কেন আল্লাহ 'উলিল আমর' (নেতৃত্ব) নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন?"
উত্তরে বলা হবে: এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণ:

সৃষ্টিজগতকে যখন একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা হয়েছে এবং সেই সীমা অতিক্রম না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (যেহেতু সীমা লঙ্ঘন করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য), তখন এমন একজন 'বিশ্বস্ত রক্ষক' নিযুক্ত করা ছাড়া এই ব্যবস্থা টিকে থাকা সম্ভব নয় যিনি তাদেরকে সীমা লঙ্ঘন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবেন। কারণ, এমন কেউ না থাকলে কেউই অন্যের ক্ষতির ভয়ে নিজের আনন্দ ও স্বার্থ ত্যাগ করত না। তাই আল্লাহ তাঁদের (ইমামদের) নিযুক্ত করেছেন যেন তাঁরা মানুষকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের মধ্যে দণ্ডবিধি (হুদুদ) ও বিধানসমূহ কায়েম করেন।

দ্বিতীয় কারণ:

আমরা কোনো দল বা ধর্মকেই এমন পাই না যারা একজন অভিভাবক ও প্রধান ছাড়া টিকে থাকতে পেরেছে; কারণ দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনে একজন নেতা অপরিহার্য। তাই পরম প্রজ্ঞাবান আল্লাহর হিকমত এটা মেনে নেয় না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতকে এমন একটি বিষয়ে (নেতৃত্ব)

নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন যা তাদের জন্য অপরিহার্য এবং যা ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারে না। ইমামের মাধ্যমেই তারা শত্রুর মোকাবিলা করে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (ফে) বণ্টন করে, জুমুআ ও জামাত কায়েম করে এবং জালেমের হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করে।

তৃতীয় কারণ:
যদি আল্লাহ তাঁদের জন্য একজন প্রতিষ্ঠিত, আমানতদার ও সংরক্ষক ইমাম নিযুক্ত না করতেন, তবে শরীয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং দ্বীন বিদায় নিত। সুন্নত ও বিধানসমূহ পরিবর্তিত হয়ে যেত; বিদআতিরা এতে নতুন কিছু যোগ করত এবং নাস্তিকরা এখান থেকে সত্যকে কমিয়ে দিত, আর তারা মুসলমানদের কাছে বিষয়টিকে বিভ্রান্তিকর করে তুলত। কারণ আমরা দেখেছি যে মানুষ অপূর্ণাঙ্গ, মুখাপেক্ষী এবং ত্রুটিযুক্ত; তাদের প্রবৃত্তি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তার জন্য যদি একজন সংরক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত না করা হতো,

তবে আমাদের বর্ণিত উপায়েই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। শরিয়ত, সুন্নত, বিধান ও ঈমান বদলে যেত; আর এতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের বিনাশ ঘটত [২৭]।

ইমাম রেজা (আ.) এই অনুচ্ছেদে ইমামতের আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এটি ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং মহান আল্লাহর দণ্ডবিধি (হুদুদ) ও বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য একটি মৌলিক উপাদান। ইমাম রেজা (আ.) এর স্বপক্ষে আরও বহুবিদ কারণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

উপসংহার

ইমামত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি অবস্থান; কারণ এটি উম্মাহকে রক্ষা করে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাযত করে। এটি মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং উম্মাহ যা কিছু প্রত্যাশা করে তার সবকিছুই বাস্তবায়ন করে। ইমাম রেজা (আ.) এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি তিনি আহলে বাইত (আ.)-এর ইমামগণের প্রতি জালেম শাসকদের অবস্থান, ইমামের আলামত বা চিহ্নসমূহ, এবং ইমামগণ যে জমিনের বুকে আল্লাহর খলিফা—তা সুস্পষ্ট করেছেন। এছাড়াও তিনি ‘উলিল আমর’ বা ঐশী নেতৃত্বের আনুগত্য করার পেছনের হিকমত ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

টীকা (পাদটীকা)

[১] সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৩৮।

[২] সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩।

[৩] সূরা আল-বাক্কারাহ, আয়াত: ১২৪।

[৪] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭২ ও ৭৩।

[৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৮।

[৬] সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৬।

[৭] আল-বিকা: এর অর্থ হলো উঁচু টিলা।

[৮] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮।

[৯] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬।

[১০] সূরা আল-কালাম, আয়াত: ৩৬ – ৪১।

[১১] সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪।

[১২] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২১ – ২৩।

[১৩] সূরা আল-বাক্কারাহ, আয়াত: ৯৩।

[১৪] সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২১।

[১৫] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৫।

[১৬] সূরা আল-বাক্কারাহ, আয়াত: ২৬৯।

[১৭] সূরা আল-বাক্কারাহ, আয়াত: ২৪৭।

[১৮] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩।

[১৯] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৪ ও ৫৫।

[২০] সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২১।

maqtabethaqalayn.com

[২১] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০।
[২২] সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৮।
[২৩] সূরা আল-মুমিন (গাফির), আয়াত: ৩৫।
[২৪] সাদুক, উয়ুনু আখবারির রেজা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৬।
[২৫] সাদুক, উয়ুনু আখবারির রেজা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৩।
[২৬] কুলাইনি, উসূলুল কাফি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৩।
[২৭] সাদুক, উয়ুনু আখবারির রেজা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০০।

গবেষণার উৎসসমূহ (তথ্যসূত্র)

১. সাদুক, মুহাম্মদ, উয়ুনু আখবারির রেজা (আ.), সম্পাদনা ও টীকা: হুসাইন আল-আলামি, বৈরুত, মুয়াসসাসাতুল আলামি, ১৪০৪ হিজরি।
২. কুলাইনি, আল-কাফি, তেহরান, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৮ (সৌর বর্ষ)।

maqtabethaqalayn.com